দ্বিতীয় খণ্ড

AMITRAKSHAR PUBLISHERS

গল্পকথা

একালের পর্যালোচনা

সম্পাদনা

চিত্ততোষ পৈড়া

অর্জুন কুমার দাস

গল্পকথা

একালের পর্যালোচনা

দ্বিতীয় খণ্ড

সম্পাদনা

চিত্ততোষ পৈড়া

অর্জুন কুমার দাস

AMITRAKSHAR
PUBLISHERS
AN ISO 9001:2015/QMS/092020/19534

গল্পকথা একালের পর্যালোচনা (২য় খণ্ড)
—সম্পাদনা চিত্ততোষ পৈড়া এবং অর্জুন কুমার দাস

GOLPOKATHA EKALER PARJALOCHANA (DWITIYA KHANDA)
— Edited by Chittatosh Paira & Arjun Kumar Das

ISBN: 978-93-6008-712-8

প্রকাশক:

অমিত্রাক্ষর পাবলিশার্স
১/১৯৯, যোধপুর পার্ক, গড়িয়াহাট রোড,
কলকাতা- ৭০০০৬৮

গ্রন্থসত্ত্ব: © সুমনা পাত্র (পৈড়া) ও মণিকা গিরি দাস

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ২০২৩

প্রচ্ছদ: বিশ্বজিৎ মেট্যা

বর্ণবিন্যাস: বিশ্বনাথ দাস

মুদ্রক: এম. এণ্টারপ্রাইজ

মূল্য: ৬০০.০০ টাকা

Website : www.amitrakshar.co.in
Email: amitraksharpublishers@gmail.com

এই বইটির সর্বস্বত্ব প্রকাশকের এবং অন্য কোনো প্রকাশকের অনুমতি ছাড়া সংরক্ষিত আছে। বইটি বর্তমান সংস্করণের বাঁধাই ও আবরণী অন্য কোনো রূপে বা আকারে ব্যবসা অথবা পুনর্বিক্রয় করা যাবে না এবং যে কোনো ইলেকট্রনিক, যান্ত্রিক, ফটোকপি, রেকর্ডিং বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্যসঞ্চয় বা স্বত্বাধিকারীর অনুমতি ছাড়া কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন, সঞ্চয় বা বিতরণ করা যাবে না। সকল অধিকার সংরক্ষিত এবং এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সূচিপত্র

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৯শে মে ১৯০৮ - ৩রা ডিসেম্বর ১৯৫৬)

প্রাগৈতিহাসিক: সার্বিক মূল্যায়ন— ড. অমর সাহা ১

হারানের নাতজামাই: তেভাগার প্রতিচ্ছবি— কাঞ্চন ঘড়া ৬

সরীসৃপ: মানব-স্বভাব ও তার অন্তর্রহস্যের মূল্যায়ন— রবীন্দ্রনাথ মান্না ১৩

শিল্পী: শিল্পী এবং শিল্পের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই— ড. আশিস কুমার সাহু ১৯

দুঃশাসনীয়: কঠোর বস্ত্র সংকটের কাহিনি— কিরণময় পাল ২৭

ছেলেমানুষী: বিষয়ের অভ্যন্তরে— দীপেন দাস ৩২

দ্বিতীয় অধ্যায়

আশাপূর্ণা দেবী

(৮ই জানুয়ারি ১৯০৯ - ১৩ই জুলাই ১৯৯৫)

ছিন্নমস্তা: একটি পাঠ পর্যালোচনা— বিদ্যুৎ মণ্ডল ৩৬

তৃতীয় অধ্যায়

সুবোধ ঘোষ

(১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯০৯ - ১০ই মার্চ ১৯৮০)

ফসিল ও সুন্দরম্: সমাজ বাস্তবতা ও বিচিত্র মানসিকতার অনন্য চিত্রণ
— সুরঞ্জনা জানা ৪৪

চিত্তচকোর: বিশ্লেষণের আলোকে— সনৎ পান ৪৬

চতুর্থ অধ্যায়

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

(২০শে আগস্ট ১৯১২ - ১লা আগস্ট ১৯৮২)

সমুদ্র ও গিরগিটি: প্রকৃতি, নারী, যৌনতার রসায়ন— ড. অন্তরা ঘোষ ৭৩

দশম অধ্যায়

ফণীশ্বরনাথ রেণু

(৪ঠা মার্চ ১৯২১- ১১ই এপ্রিল ১৯৭৭)

দাহ: ইতিহাসের পটে আঁকা এক বিদ্ধ-বিহঙ্গী— অমিত কুমার দাস ২০৬

একাদশ অধ্যায়

বিমল কর

(১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯২১ - ২৬শে আগস্ট ২০০৩)

ইঁদুর: আত্মানুসন্ধানের গল্প— অন্বেষা বিশ্বাস ঘোষ ২২৬

আত্মজা: বিশ্লেষণের আলোকে— সোনালী দাস ২৩৩

বরফ সাহেবের মেয়ে: কৈশোরের দ্বিধাগ্রস্ত যৌবনের আলেখ্য — চিন্ময় কুমার মাইতি ২৪২

সুধাময়: আত্মবীক্ষা ও জীবন সমীক্ষার জোড়কলম— দেবযানী মুখোপাধ্যায় ২৫৪

জননী: মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে— সুশোভন পাইন ২৬৫

দ্বাদশ অধ্যায়

রমাপদ চৌধুরী

(২৮শে ডিসেম্বর ১৯২২ - ১৯শে জুলাই ২০১৮)

করুণ কন্যা: 'উপেক্ষিত' ইতিহাসের অনুসন্ধান— ফাল্গুনী সিনহা মহাপাত্র ২৭৩

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সলিল চৌধুরী

(১৯শে নভেম্বর ১৯২৩ - ৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৫)

ড্রেসিং টেবিল: সময়ের দর্পণ— ড. প্রীতম চক্রবর্ত্তী ২৭৮

চতুর্দশ অধ্যায়

সমরেশ বসু

(১১ই ডিসেম্বর ১৯৪০ - ১২ই মার্চ ১৯৮৮)

আদাব: মানবতার উজ্জ্বল দীপবর্তিকা— রাজীব নন্দ গোস্বামী ২৯১

শানা বাউরীর কথকতা: বেদনায় ও মানবিয়ানায়— ড. চন্দন বাঙ্গাল ২৯৮

স্বীকারোক্তি ও শহীদের মা: একটি বিশ্লেষণ— ড. নরেন হালদার ৩০৮

ISBN : 978-93-6008-712-8

জননী: মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে

সুশোভন পাইন

বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে যেসব লেখক মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় তাদের প্রায় সমস্ত গল্পের মধ্যে প্রকাশ করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন বিমল কর। ছোটগল্পের পাশাপাশি উপন্যাস, প্রবন্ধ, স্মৃতিকথা ইত্যাদি লিখলেও ছোটগল্পের আঙিনায় বিমল কর একটি স্মরণীয় নাম। তাঁর গল্পের বিষয় ভাবনা ও ভাষাগত অনন্যতা তাকে একটি স্বতন্ত্র স্থান দিয়েছে। তাঁর গল্পের ভাষা ও বিষয়বস্তুর সুদক্ষ চিত্র শিল্পীর মতো রঙ তুলির গুণে অত্যাশ্চর্য সৃষ্টি হয়ে উঠেছে। সর্বমোট তিনি প্রায় দুই শতাধিক গল্প লিখেছেন। 'বরফ সাহেবের মেয়ে', 'ইঁদুর', 'আত্মজা', 'নিষাদ', 'মানব পুত্র', 'জননী', 'পিয়ারীলাল বার্জ', 'সুধাময়', 'সোপান', 'মোহনা', ইত্যাদি তাঁর রচিত বিখ্যাত কয়েকটি ছোটগল্প। গল্পগুলির মধ্যে বিমল কর তাঁর জীবন অভিজ্ঞতা ও বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে জাত অনুভূতিকে নিজস্ব ভাষায় প্রকাশ করেছেন। জগত ও জীবন সম্পর্কে তাঁর দার্শনিক উপলব্ধি ও গল্পগুলির মধ্যে লক্ষ করা যায়। তার কোনো গল্পের বিষয় সীমান্ত বাংলার কোনো কয়লাখনি অঞ্চলের কাহিনী, আবার কোনো গল্পে মফস্বল শহরের কথা, কোনো গল্পে মৃত্যু ভাবনা, আবার কোনো গল্পে মানব মনের সংশয়-সঙ্কট ইত্যাদি স্থান পেয়েছে। এছাড়া এসবের বাইরে মানুষের মনোজগতের বিচিত্র চিন্তা লোভ-লালসা-নিষ্ঠুরতা ইত্যাদিকেও গল্পের বিষয়বস্তু করেছেন।

বিমল করের গল্পের অভ্যন্তরীণ শিল্পরূপে প্রবেশ করলে বেশ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন—

১। প্রথমত, তাঁর গল্প মুখ্যত বিবৃতি বা বিবরণধর্মী নয়— বরং অন্তর্গত অন্তর্মুখী স্বভাবকথনের যেন সাংকেতিক দ্যুতি। পড়তে পড়তে স্তব্ধ হয়ে ভাবতে হয়। ভাবতে ভাবতে চরিত্রের অন্তর্লোকে প্রবেশ করতে হয় এবং প্রবেশ করার পর স্পষ্ট বোঝা যায়— তিনি মানবমনের নিহিত সুপ্তজগতের কারিগর ও কথাকার।

২। দ্বিতীয়ত, তাঁর গল্প বাইরের দিকে যায় না— সত্তার ভেতরের নিভৃত চৈতন্যের দিকে যায়। তিনি যেন মানুষের ভেতরের স্বরূপ খুঁজছেন এবং সেইজন্যই মনোজগতের স্তর-স্তরান্তর নানা দিক থেকে বিশ্লেষণ করেছেন। অনেকটা যেন অন্ধকারে ঢাকা গুহা ও গুহালিপি পড়বার জন্য তিনি আস্তে আস্তে স্তিমিত প্রদীপের শিখাকে একটু একটু করে সযত্নে উসকে দিচ্ছেন।

ISBN : 978-93-6008-712-8

৩। তৃতীয়ত, তাঁর গল্প সাদামাটা সরল রৈখিক নয়— গূঢ় ও গাঢ় অবচেতনের বইরৈখিক বহিঃপ্রকাশ। বিভিন্ন চরিত্রকে তিনি খড়কুটোর মতো একজায়গায় জড়ো করেন এবং সেইসব জড়ো করা চরিত্রের পারস্পরিক তুল্যমূল্য পর্যবেক্ষণের মধ্যে দিয়ে মানবজীবনের বহুমুখী স্বর ও সংকট প্রতিফলিত করেন।

'জননী' গল্পটিও আসলে ওই সূত্রাকার বৈশিষ্ট্যের সার্থক উদাহরণ। এখানে 'মা' একটি কেন্দ্র— আর সেই কেন্দ্র ধরেই ভ্রাম্যমান ও আবর্তিত হচ্ছে তাঁর সন্তানসন্ততি— আর এই ঘনীভূত আবর্তনের মধ্যে দিয়ে একইসঙ্গে 'মা' ও তাঁর 'সন্তানবঙ্গের' স্বরূপ ক্রমশ উন্মোচিত হয়ে যাচ্ছে। এই গল্পটি যেন জাদুকরের কলমে লেখা নিভৃত জীবনমন্থনের গল্প— বিচিত্র ও বহুরূপী।

ছোটগল্পকার বিমল কর-এর জীবনী অনুসন্ধান করে আমরা জানতে পারি, তাঁর ছেলেবেলা ও কৈশোর জীবন অতিবাহিত হয়েছে শিল্পাঞ্চল এলাকায়। ধানবাদ, আসানসোল, কুলটি, হাজারিবাগ, ঝরিয়া এই সমস্ত কয়লাখনি এলাকায় তার জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ অতিবাহিত হয়েছে ফলে, তার প্রথম জীবনের গল্পগুলিতে এই অঞ্চলের মানুষের কথা, অন্তরঙ্গ পরিবেশের কথা বিভিন্নভাবে উঠে এসেছে। কলেজ জীবনে শহর কলকাতার সাথে সম্পর্ক গড়ে উঠলেও লেখার সময় শহর বিযুক্ত মানুষের কথা, জীবনের কথা বারবার স্থান পেয়েছে। এমনকি স্বয়ং বিমল কর ও হীরক রায়কে দেওয়া লেখকের 'কৈফিয়ৎ' নামাঙ্কিত একটি লেখায় স্পষ্টতই জানিয়েছেন— "কলকাতাকে ভালোবাসলেও লেখার সময় আমার মাথায় যেসব বিষয় এবং চরিত্র ঘোরাফেরা করে তাদের আমি এই খেপা শহরের বাইরে যেন অনেক নিজের করে অনুভব করি।"[১]

বিমল কর-এর রচিত প্রথম গল্প প্রকাশিত হয়েছিল 'মাসিক প্রবর্তক' পত্রিকায়। গল্পের নাম 'অম্বিকা নাথের মুক্তি', কারো কারো মতে 'অম্বিকানাথের মুক্তি' গল্পটি যখন বিমল কর লিখেছিলেন তখন তার বয়স ছিল বাইশ তেইশ বছর। গল্পের বিষয় জাগতিক জীবন ও মৃত্যু চিন্তা। এরপর বিমল কর-এর আরেকটি বিখ্যাত গল্প 'দ্বন্দ্ব' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পের নাম 'পিয়ারীলাল বার্জ'। এই গল্পের বিষয়বস্তুতে একটি নতুন ধারার সংযোজন ঘটে। গল্পটি লেখার পর তখনকার 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক সাগরময় ঘোষের নজরে পড়েন। পরবর্তীকালে ত্রৈমাসিক উত্তরসুরি পত্রিকায় তাঁর 'ইঁদুর' গল্পটি প্রকাশিত হলে সাগরময় ঘোষ সরাসরি বিমল করকে তার বন্ধু গৌরকিশোর ঘোষের সহায়তা নিয়ে দেশ পত্রিকায় গল্প লিখতে আহ্বান করেন। এরপর তিনি 'দেশ' ও 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় একটার পর একটা গল্প লিখতে থাকেন। দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রথম গল্প 'বরফ সাহেবের মেয়ে'। আমাদের

আলোচ্য 'জননী' গল্পটির ১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসে শারদীয় দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই গল্পটির মধ্যেও রয়েছে মৃত্যু প্রসঙ্গ। মৃত্যু মানুষের জীবনের একটি স্বাভাবিক ও অনিবার্য পরিণতি এ বিষয়ে কোনো সংশয় নেই, কিন্তু বিমল করের দৃষ্টিতে মৃত্যু জীবনের শেষ পরিণতি নয়, একটা নতুন ভাবনা, নতুন চেতনা। এই গল্পটির তথ্য ও সূত্র সম্পর্কে ধীরেন শাসমল-কে দেওয়া একটি সাক্ষাতকারে বলেছেন—

"বিহারের দিকে থাকতাম, সেখানকার গাঁয়ে-গঞ্জে কোনো সাঁওতাল পাড়ায় একটা ছবি দেখেছিলাম। মাটির ঘর, দেওয়ালে একটা বাচ্চা ছেলের ছবি আঁকা, গাধা কিংবা ঘোড়ার পিঠে বসে রয়েছে, হাতের লাঠিটা কাঁধে, লাঠির দু'পাশে দু'টো জিনিস ঝুলছে, একদিকে একটা ঘটি, অন্যদিকে একটা পুঁটলি। সেই গ্রাম্য ছবির অর্থ শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। শুনেছিলাম ওই বাড়ির একটি বালক মারা গেছে কিছুদিন আগে, বাড়ির লোকে বাইরের দেওয়ালে ছবিটি এঁকে রেখেছে— তাদের সংস্কার অনুযায়ী। ওদের সংস্কার বলে— মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে যাওয়ার পথ দীর্ঘ, এই দীর্ঘ পথ যাওয়ার জন্য মৃত মানুষটিকে কিছু পাথেয় দিতে হয়। এই ছবিটা দীর্ঘদিন আমার মনে ছিল। ছবিটার কথা মনে পড়লেই কেমন যেন বিষণ্ণ হয়ে যেতাম। কল্পনার অভিনবত্ব ও আমাকে ভাবাতো। অনেককাল পরে এই ছবির মূল ভাবটাই যেন আমি মনের মতো করে 'জননী' গল্পে প্রকাশ করতে চেয়েছিলাম। আমাদের ইহলোক আছে, পরলোক আছে কিনা জানি না। যদি থাকতো, তবে তার পাথেয় হিসেবে কি দেওয়া যেত, সেই ভাবনা থেকেই এই গল্প।"[২]

সুতরাং লেখকের বক্তব্য থেকে বোঝা যায় তাঁর গল্পের বিষয়ভাবনার মধ্যে জীবন অন্বেষণের একটি মহতি প্রয়াস রয়েছে। মৃত্যু প্রসঙ্গ গল্পের মধ্যে মুক্ত স্থান অধিকার করেছে ঠিকই কিন্তু এই মৃত্যুকে কেন্দ্র করে মানুষের জীবন ভাবনার দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। গল্পের এক একটি চরিত্রের নিজস্ব ভাবনায় সেই জীবন সম্পর্কিত উপলব্ধির কথা উচ্চারিত হয়েছে, যে উপলব্ধির প্রকাশ ঘটেছে জননী চরিত্রটিকে কেন্দ্র করে। ভাঙা-গড়া, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির মধ্য দিয়েই মানুষের জীবন আবর্তিত হয়। পৃথিবীতে এমন কোনো মানুষ নেই যাকে দেখে বলা যেতে পারে তিনি সম্পূর্ণ, প্রাপ্তির খাতায় কোনো শূন্যতা নেই। আলোচ্য গল্পের মধ্যেও আমরা দেখি মায়ের মৃত্যুর পর তারই সন্তানদের চোখে অপূর্ণতার টুকরো টুকরো ছবি প্রকাশিত হয়েছে। পাঁচ সন্তান যেভাবে সদ্যমৃতা মায়ের অসম্পূর্ণতাকে কাটাছেঁড়া করেছে তা সন্তানদের দিক থেকে

ISBN : 978-93-6008-712-8

কতখানি বাস্তবসম্মত ও যথাযথ হয়েছে সে প্রশ্ন পাঠক মাত্রই মননে ও চেতনায় এসে যায়। কেননা, মায়ের অসম্পূর্ণতা বা অপূর্ণতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করার একটা দিক হল নিজেদের ব্যর্থতা-কে আড়াল করা। আবার, এই প্রশ্নবানে জর্জরিত করার মধ্য দিয়ে পৃথিবীর সব মানুষকেই প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। কেননা কোনো মানুষেই সম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারে না। তাই পাঁচ সন্তানের চোখে জননী চরিত্রের অপূর্ণতার ছবি কতখানি যুক্তিসম্মত সে বিষয়ে আমরা যথেষ্ট সন্দিহান।

গল্পটির দিকে তাকালে দেখতে পাই, জননীর মৃত্যু-কে কেন্দ্র করে, তার সন্তানদের কথোপকথোনে গল্পটি এগিয়েছে। তাই আলোচ্য গল্পে জননীর মৃত্যু গল্পের সূচনা দৃশ্য হলেও গল্পের বিষয়বস্তু মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এগোয়নি; এগিয়েছে মৃত্যু পরবর্তী ভাবনাকে কেন্দ্র করে। যেখানে তারই সন্তানদের কথাবার্তায় প্রকাশিত হয়েছে, মায়ের মৃত্যুর পর তাঁর পারলৌকিক ক্রিয়া-কর্ম শেষ হয়ে যাওয়ার পর মায়ের স্মৃতি তর্পনের উদ্দেশ্যে বাঁধানো স্মৃতি বেদীর উপর বসে পাঁচ সন্তান যখন নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনায় মগ্ন হয়েছে তখন মায়ের মেজো ছেলে দীনু একটা ছবির কথা উল্লেখ করে। এই ছবিটি আদিবাসীদের মৃত্যু পরবর্তী ভাবনাকে আশ্রয় করে রচিত। আদিবাসী জীবনে মৃত্যু সম্পর্কে নানা বিশ্বাস ও সংস্কার রয়েছে। দীনু এখানে যে ছবির কথা বলেছে সেটি একটি আদিবাসী পরিবারের বাচ্চা ছেলের ছবি। যে ছেলেটি কিছুদিন পূর্বে মারা গেছে। তাই তাদের সংস্কার ও বিশ্বাস অনুযায়ী পরলোকগত মানুষের স্বর্গলোকে যাওয়ার পথ দীর্ঘ করার জন্য কিছু পাথেয় রেখে দিতে হয়। আলোচ্য গল্পেও দেখা যায় আদিবাসী পরিবারের সেই ছোট ছেলেটির জন্য ঘোড়া, লাঠি, খাদ্যসামগ্রী ও তেষ্টার জল দেওয়া হয়েছে। ইহলোকের ভাবনা আর পরলোকের চিন্তা একই সঙ্গে ছবিটির মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বাড়ির মেজোছেলে দীনু এখানে যে ছবির কথা উল্লেখ করেছে সেটি লেখক বিমল কর যখন বিহারে থাকতেন তারই সন্নিহিত গ্রামে গঞ্জে বা সাঁওতাল পাড়ায় এরকমই ছবি দেখেছিলেন। যার উল্লেখ আমরা পূর্বেই করেছি। দীনুর মুখে ছবির এই বিষয় ভাবনার কথা শুনে বড়দি অনুপমার মন প্রশ্নসন্নিহিত হয়েছে। তিনি তার ভাই বোনদের উদ্দেশ্যে বলেছেন— "আমায় যদি কেউ মা'র হাতে কিছু দিতে বলে, কি দেব রে।" বড়দির মুখে এই প্রশ্ন শুনে উপস্থিত সকলে ভাবতে বসে তারা তাদের মা'কে কি দিতে পারে ? এই বোধ থেকে উপস্থিত সকলে তাদের মায়ের সম্পর্কে নিজস্ব মনোভাব প্রকাশ করেছে। আর তাদের এই মনোভাব থেকে মায়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

মায়ের মৃত্যুর পর মাকে কি দেওয়া যায় সেটা যখন পাঁচ ভাইবোন এক

ISBN : 978-93-6008-712-8

সাথে ভাবতে বসলো তখন এক একজনের কথার সূত্রে পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য উঠে আসে। বড়দা'র কথার সূত্রে গল্পকথক কড়ি জানায়—

"এই সংসারে মা কি পায়নি, কি অভাব তার ছিল, কি পেলে মা-র অভাব থাকতো না, আমরা এখন তাই ভাবছিলাম। মা'র এই পরবর্তী যাত্রায় আমরা বোধ হয় মাকে সেই জিনিস দিতে চাইছিলাম যা এখানে দিতে পারিনি।"

গল্পকথক 'কড়ি'র এই বক্তব্য থেকে মায়ের জীবনে চলার পথে যে অসম্পূর্ণতা বা অপূর্ণতা ছিল তা আমরা বুঝতে পারি। তাই পাঁচ সন্তান মিলে মায়ের এই অভাবকে পূরণ করতে চেয়েছে। যেমন, বড়দার মতে মায়ের প্রকৃত ভালোবাসা বোঝার মতো মনের অভাব ছিল। তাই বড়দা বলেছে—

"আমি মাকে আমার সেই ভালোবাসার মন দিতে পারি।"

বড়দি'র মনে হয়েছে— মায়ের মধ্যে মানুষের উচিত সাহসের অভাব ছিল। তাই বড়দি বলেছে— 'মাকে আমি মানুষের উচিত সাহস দিতে পারিনি। মা যেন সেই সাহস পায়।" ছোটো মেয়ে নিরুপমা বিশ্বাস করে মায়ের মনে ভরসা কম ছিল, তাই তার বক্তব্য— "আমি মা'কে আর কিছু দিতে পারিনা। মন ছাড়া, আশা ছাড়া, ভরসা ছাড়া। মা যেন তার মনে ভরসা পায়।" মায়ের ছোটো ছেলে মায়ের মধ্যে দেখেছে স্বার্থপরতা, তাই সে মাকে স্বার্থত্যাগ দিতে চেয়েছে। তার বক্তব্য— "মা স্বার্থত্যাগ জানতো না। ...... মা দীন ছিল, আর মন কৃপণ ছিল। .... আমার যদি কিছু দিতে হয় আমি মাকে স্বার্থত্যাগ দেবো।" তাঁর সর্বশেষ মায়ের মেজো ছেলে দীনু বলেছে— "মা যে কত অন্ধ ছিল আমি জানতাম। .....এই অন্ধ চোখ মাকে আর দিতে ইচ্ছে করে না। মা আমার হৃদয়ের চক্ষু পাক।"

আলোচ্য গল্পে পাঁচ ভাই-বোন পাঁচ ভাই-বোনের চোখে মায়ের যে অসম্পূর্ণতা বা অপূর্ণতার দিকগুলি ধরা পড়েছিল সেগুলি তারা মাকে দিতে চেয়েছে। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত সম্প্রদায় বা জাতির মধ্যেই নিজস্ব কিছু সংস্কার বা ধারণা রয়েছে। প্রাচীন মিশরে যেমন মানুষের মৃত্যুর পর মমি দেওয়া হতো, তার সঙ্গে রেখে দেওয়া হতো প্রচুর উপাদান। আমাদের হিন্দু সমাজেও মৃত মানুষকে সৎকার করার সময় যেমন বিভিন্ন উপাদান সামগ্রী মৃতদেহের উপর রাখা হয় তেমনি সেই মৃত মানুষটির পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম নিয়ম মেনে করা হয়। এই সমস্ত কিছুর পেছনে থাকে মৃত মানুষটির আত্মার প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা ও শান্তি প্রার্থনা। বিমল কর তাঁর এই গল্পেও মৃত্যু পরবর্তী ভাবনার কথা ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু তাঁর এই ভাবনায় কোনো বস্তুগত বিষয় স্থান পায়নি। পরিবর্তে তিনি মৃত মানুষের অপূর্ণতার দিকগুলি তুলে ধরে প্রকৃতপক্ষে

ISBN : 978-93-6008-712-8

পূর্ণতার স্বাদ দিতে চেয়েছেন। সুতরাং পাঁচ সন্তানের মুখ দিয়ে মায়ের অপূর্ণতার বা অসম্পূর্ণতার টুকরো টুকরো ছবি তুলে ধরে মায়ের চরিত্রটিকেই পূর্ণতার মহিমা দান করেছেন। আর এইভাবে জীবনের সকল প্রকার সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে একজন আদর্শ জননী রূপে মা পরোপারের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছেন। ইহজীবনের দোষ ত্রুটি মুক্ত হয়ে অনন্ত ধামে যাত্রা করেছেন— এটা যেমন সত্য তেমনি এও সত্য যে, তিনি আর পাঁচ সন্তানের সাধারণ জননী হয়ে বিরাজ করেননি; পাঁচ সন্তানের প্রত্যাশিত বা কাঙ্ক্ষিত জননী হয়ে উঠেছেন। অবশ্য পাশাপাশি আমাদের এও মনে রাখতে হবে আলোচ্য গল্পে লেখক মায়ের চরিত্রে যে পাঁচটি অপূর্ণতার দিক উল্লেখ করেছেন তা এই বিশ্ব মানব সংসারের প্রতিটি মানুষের মধ্যে খুঁজলেই পাওয়া যাবে। লেখক তার গল্পের মধ্যে এই চিরন্তন সত্যেরও সন্ধান দিয়েছেন, তাই গল্পটি আর একটি মায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তা হয়ে উঠেছে সর্বজনীন।

গল্পের মধ্যে পাঁচসন্তানের আত্মকথন মূল বিষয় এবং তাদের এই আত্মকথনের মূল লক্ষ্য হল মা। মায়ের চরিত্রে যে একটা সংস্কারবদ্ধ মনের ছাপ ছিল তা বড়দির আত্মকথা থেকে জানা যায়। বড়দি তার বিয়ের কয়েক বছরের মধ্যে স্বামীকে ত্যাগ করে বাড়িতে ফিরে এসেছিল। তার স্বামীর ছিল চামড়ার ব্যবসা। অর্থনৈতিক স্বচ্ছল, তথাপি স্বামীর অত্যাচারের শেষ ছিল না। বড়দি তাই স্বামীর অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচতে এই বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। আর কখনও ফিরে যায়নি। কিন্তু মা চেয়েছিলেন বড়দিকে আবার তার স্বামীর বাড়ি পাঠাতে, কিন্তু বড়দি রাজি হয়নি। পরিবর্তে বড়দি চেয়েছিলো আবার বিয়ে করতে, কিন্তু সামাজিক মর্যাদার কথা ভেবে মা আর বড়দির বিয়ে দিতে রাজি হননি। তিনি বলেছিলেন— "এ বাড়ির মর্যাদা নষ্ট হোক এমন কিছু করতে আমি দেবো না।" সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে তিনি সামাজিক মর্যাদা নষ্ট হওয়ার ভয়ে দ্বিতীয়বার বড়দির বিয়ে দিতে রাজি হননি। সেই কারণেই বড়দি মায়ের মৃত্যুর পর তাকে মানুষের উচিত সাহস দিতে চেয়েছে।

বড়দার আত্মকথন থেকে জানা যায়, সে বিয়ে করেনি বলে মায়ের মনে একটা দুঃখ ছিল। গল্প থেকে জানা যায় বড়দার বিয়ের জন্য কনক নামের যে মেয়েটিকে মা পছন্দ করেছিলেন সেই মেয়েটিকে বড়দার বন্ধু অবনী ভালোবাসতো। আর এই কারণেই বড়দা এই বিয়েতে মত দেয়নি। কিন্তু বড়দার কাছে একথা জানার পরেও মা বড়দাকে বিবাহ করতে অনুরোধ করেছে এই বলে— যে কনক অপরূপা সুন্দরী ফলে তার বংশধররাও সুন্দর হবে। মায়ের এই ভাবনার কথা জানতে পেরে বড়দার গলায় আক্ষেপের সুর ধ্বনিত হয়েছে। বড়দা বলেছে— "আমি সৌন্দর্য ভালোবাসি কিন্তু ভালোবাসা আরও বেশি ভালোবাসি।" অথচ এই ভালোবাসার কোনো গুরুত্ব মায়ের

ISBN : 978-93-6008-712-8

চোখে ধরা পড়েনি। সেই কারণেই বড়দা, মায়ের মৃত্যুর পর মা'কে ভালোবাসার মন দিতে চেয়েছে।

বাড়ির ছোটমেয়ে নিরুপমা তার আত্মকথনে জানিয়েছে, মা তার সন্তানদের সুখ-শান্তির উর্ধ্বে বাহ্যিক স্বচ্ছলতা ও খাওয়া পরাকে বুঝতেন। মনের ভেতরের কথাকে মনের নিভৃত শান্তির উপাদান, এটা বিশ্বাস করতেন না। নিরুপমা তাই বলেছে অসুস্থ হয়ে যখন সে শয্যাশায়ী তখন তার বন্ধু সুশান্ত মাঝে মধ্যে বাড়িতে আসতো। সুশান্ত এসে তাকে ভরসা দিত, যাতে একটু শান্তি ও স্বস্তি অনুভব করতে পারে। কিন্তু মা সেই সুশান্তকে বাড়িতে আসতে বারণ করে দেয়। তিনি সুশান্তর অতিরিক্ত আশা যাওয়ার মধ্যে মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার আশঙ্কা করেছিলেন। কিন্তু মেয়ের মনের শান্তির কথা ভাবেননি। মা চাইতেন সংসারকে সবসময় দোষ প্রতিমুক্ত রাখতে। তাই মায়ের মৃত্যুর পর নিজের আত্মকথায় ছোট্ট বলেছে— "মা আমার অসুখটাই দেখেছিলো, সুখ দেখেনি। মা জানতো না, জগতে সব রোগ কেবল ডাক্তার দিয়ে সারানো যায় না।" মায়ের মনের এই অভাবকে পূরণের জন্য ছোট মেয়ে নিরুপমা মায়ের মনে ভরসা দিতে চেয়েছে।

'জননী' গল্পের কথক হলো কড়ি। সে তার জীবন অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করেছে কাশি যাত্রার ঘটনা দিয়ে। সেখানে কথকের বাবার এক বন্ধু শচীন জ্যাঠামশাই কথকের বাবার সঙ্গে কাঠের ব্যবসা করতেন। বাবার মৃত্যুর পর শচীন জ্যাঠামশাই এতদিন সমস্ত দায়িত্ব পালন করেছেন। কথকের মা কাশীতে এসেছেন তার বাবার পুরনো ব্যবসায় শচীর জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে কাগজপত্রের অংশীদার নাকচ করিয়ে আনতে। শচীন জ্যাঠা বাঙালী টোলার অন্ধকার গলিতে নরকের মতো ছোট্ট একটা খুপরি ঘরে থাকতেন। শচীন জ্যাঠার স্ত্রী শ্বাস রোগে শয্যাশায়ী, বড়ো ছেলে হোটেলের গাইডগিরি করে, দুটি মেয়ে– একটির পা ডাঙা থেকে পড়ে খোড়া হয়ে গেছে, অন্যটি লোকের বাড়িতে রান্নার কাজ করে। আর বড়ো ছেলের বউ দুটি বাচ্চা রেখে মারা গেছে। শচীন জ্যাঠামশাইয়ের এরকম দুর্বিষহ জীবন-যন্ত্রণার মধ্যেই কথকের মা সেদিন শচীন জ্যাঠামশাই-কে দিয়ে মাত্র দু'শো টাকার বিনিময়ে সমস্ত ব্যবসাটা নিজের নামে লিখিয়ে নিয়েছিলেন। এই ঘটনা দেখে কড়ি তার স্বভাব সিদ্ধ ভঙ্গিতে প্রতিবাদ করে। কিন্তু মা জানান অতো স্বার্থত্যাগ আমি শিখিনি। মায়ের এরূপ আচরণ কড়ির কাছে নিষ্ঠুর ও অমানবিক বলে মনে হয়েছে। তাই কড়ি মায়ের মৃত্যুর পর মাকে স্বার্থত্যাগ দিতে চেয়েছে।

'জননী' গল্পে পাঁচ ভাই-বোনের মধ্যে সবার শেষে আত্মকথা ব্যক্ত করেছে মেজদা। মেজদার নাম দীনেন্দ্র বা দীনু। দানাপুর যাওয়ার পথে ট্রেন দুর্ঘটনার কবলে

ISBN : 978-93-6008-712-8

পড়ে মেজদার দুই চোখই অন্ধ হয়ে যায়। তা সত্ত্বেও অন্তর্চক্ষু ছিল বেশ সজাগ। মানুষকে বোঝার ক্ষমতাও ছিল তার অসাধারণ। শারীরিক অন্ধত্ব মেজদাকে পঙ্গু করতে পারেনি। মেজদা জানত সংসারের শনিই মাকে অন্ধ করে রেখেছিল। তাই মেজদা বলেছে— "মা যে কত অন্ধ ছিল তা আমি জানতাম।... এই অন্ধ চোখ মাকে আর দিতে ইচ্ছে করে না।" সেজন্য মেজদা তার মা'কে হৃদয়ের চক্ষু দান করতে চেয়েছে। মেজদা বুঝেছে এই 'হৃদয়ের চক্ষু' অর্থাৎ জ্ঞানচক্ষু উন্মোচিত হলে লোভ-লালসা-স্বার্থপরতা সবকিছু থেকে মুক্তি লাভ সম্ভব।

এইভাবে দেখা যায়, পাঁচ সন্তান তাদের মায়ের মৃত্যুর পর তার অভাব বা অপূর্ণতাগুলিকে তুলে ধরেছে। আর সেগুলি মা'কে দান করার মধ্যে মায়ের প্রতি শুধু নিজেদের অন্তরতম উপলব্ধির কথা প্রকাশ করেছে তাই নয়, মায়ের পরকালের যাত্রাপথে এগুলি দান করতে চেয়েছে। যার ফলে সকল প্রকার সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে সন্তানদের দৃষ্টিতে আদর্শ জননীতে রূপান্তরিত হয়েছেন।

তাই বলা যেতে পারে লৌকিক আচার সর্বস্বতা নয়, এই গল্পে অন্তরের বিশুদ্ধ প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা দিয়ে মায়ের প্রতি সন্তানদের যথার্থ সৎকার বা শ্রদ্ধাতর্পণ প্রকাশিত হয়েছে। একথা অনস্বীকার্য যে 'মা'কে নিয়ে শাক্তপদ থেকে শুরু করে বাংলা কথাসাহিত্যে নানা সময়ে নানারকম অসামান্য সব লেখা প্রকাশ পেয়েছে। রামপ্রসাদের জগজ্জননী, রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসের আনন্দময়ী, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হারানের নাতজামাই' গল্পের হারানের মা— বাঙালি পাঠক কখনে কোনোদিনও বিস্মৃত হতে পারবে না। বিমল কর আর 'জননী' গল্পটিও ক্রমশ বহুপাঠকের পর এক আশ্চর্য উপস্থিত মনস্তাত্ত্বিক বৈচিত্র্য নিয়ে বাংলা সাহিত্যের একটি চিরস্থায়ী সম্পদে পরিণত হয়ে উঠেছে। এ যেন দুধু 'মা' নয়- জননী নয়— মাতৃস্বরূপ উদ্ধারের এক বক্র বিশ্লেষণ সুপ্ত চেতনার বিস্ময়কর উদাহরণ।

তথ্যসূত্র:

১. বীরেন শাসমল (সম্পাদিত), সম্পাদকের নিবেদন: "লেখকের কৈফিয়ৎ বিমল কর", তীব্র কুঠার ছোটগল্প বিষয়ক বিমল কর বিশেষ সংখ্যা, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা- ২০০৩।

২. বীরেন শাসমল (সম্পাদিত), "তীব্র কুঠার ছোটগল্প ও ছোটগল্প বিষয়ক বিমল করে বিশেষ সংখ্যা", প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা-২০০৩, পৃ.-৪৩।